নির্মম সত্য ঘটনার প্রতিচ্ছবি

মৌ সন্ধ্যা

১৯৭১ সাল। স্বাধীনতার জন্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে বীর বাঙালি। আর বাঙালি নিধনের নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে বর্বর পাক সেনারা। পুরুষদের তো বটেই, নির্যাতন করছে নারী ও শিশুদেরও। নানা সময় সিনেমায় উঠে এসেছে সেই আগুন রাঙা দিনের ইতিহাস। '৭১এর মা জননী' মুক্তিযুদ্ধের তেমনই সত্য কাহিনি নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র। রঙবেরঙ-এর মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনার এই পর্বে আমরা জানার চেষ্টা করবো '৭১এর মা জননী' সিনেমা নিয়ে।

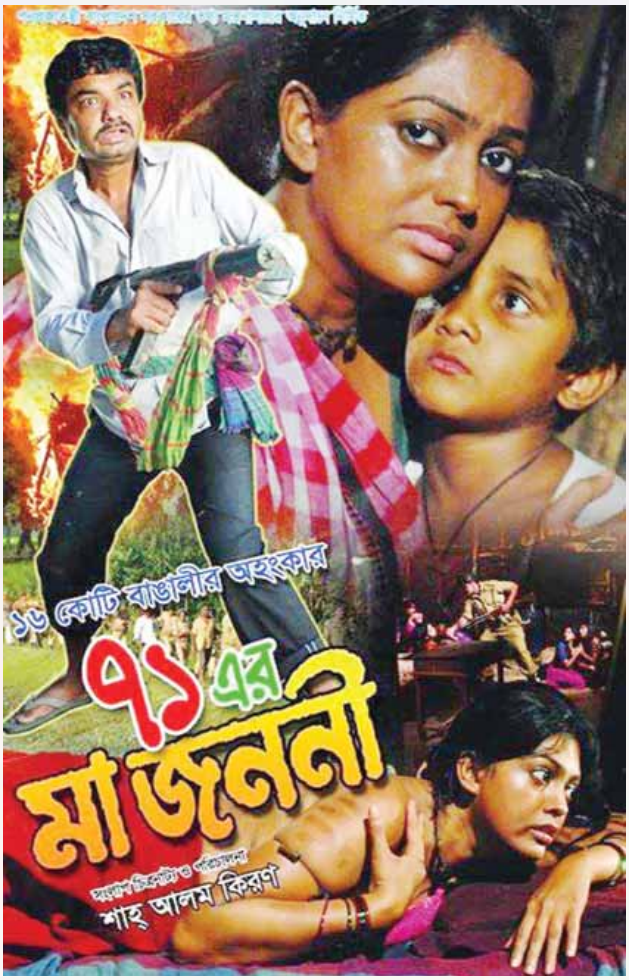

মুক্তির আলোয় '৭১এর মা জননী'

২০১৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জের একটি প্রেক্ষাগৃহে প্রথম মুক্তি পেয়েছিল '৭১এর মা জননী' সিনেমাটি। পরবর্তীতে ২০১৫ সালের ২০ মার্চ দ্বিতীয় বার মুক্তি দেওয়া হয়। সিনেমাটি ২০১৬ সালের ২৫ মার্চ তৃতীয় দফায় ঢাকার বসুন্ধরা সিটির স্টার সিনেপ্লেক্স ও যমুনা ফিউচার পার্কের ব্লকবাস্টার সিনেমাসে মুক্তি দেওয়া হয়। এছাড়া ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত ইউএস চলচ্চিত্র উৎসবে চলচ্চিত্রটি প্রদর্শিত হয়। ২০১৫ সালের ১৭ মে ছায়াছবিটি কানাডায় অনুষ্ঠিত টরেন্টো চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়। '৭১এর মা জননী' পরিচালনা করেন শাহ আলম কিরণ। নির্বাহী প্রযোজক ছিলেন ফরিদুর রেজা সাগর ও ইবনে হাসান খান। চিত্রগ্রাহক ছিলেন মাহফুজুর রহমান খান ও সম্পাদনায় ছিলেন মুজিবুর রহমান দুলু। আরও সিনেমাটির পরিবেশনায় ছিল ইমপ্রেস টেলিফিল্ম।

কী আছে '৭১এর মা জননী' সিনেমায়?

জমিলা এক গৃহবধূ। তার স্বামী হাশেম শহরে চাকরি করেন। অন্ধ শাশুড়ি আর এক ছেলেকে নিয়ে জমিলা গ্রামেই থাকেন। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ময়দানে ভাষণের পর শহরে গণআন্দোলন শুরু হয়। হাশেম গ্রামে ফিরে আসেন। তিনি গ্রামের লোকজনকে একত্রিত করেন যুদ্ধের জন্য। অপরদিকে গ্রামে পাকবাহিনী আসলে রাজাকার কাদের আলী জমিলাকে মেজর সরফরাজের হাতে তুলে দেয়। এক সময় জমিলা ক্যাম্পের অন্যান্য মেয়েদের নিয়ে রুখে দাঁড়ায় পাক সেনাদের বিরুদ্ধে।

যাদের অভিনয়ে সমৃদ্ধ '৭১এর মা জননী'

সিনেমায় একজন বীরাঙ্গনার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন চিত্রনায়িকা নিপুণ আক্তার। তার চরিত্রটির নাম ছিল জমিলা। জমিলার স্বামী হাশেম চরিত্রে অভিনয় করেন খান আসিফ আগুন। চিত্রলেখা গুহ অভিনয় করেন হাশেমের মায়ের চরিত্রে। ম. ম. মোর্শেদ অভিনয় করেন কাদের আলী নামের একজন রাজাকারের চরিত্রে। শাকিল আহমেদ অভিনয় করেন মেজর সরফরাজ চরিত্রে। মিশু চৌধুরী অভিনয় করেন জরিনা চরিত্রে। সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করেন শর্মিলী আহমেদ, গুলশান আরা, রাকিব, আবদুল হালিম আজিজ, জামিলুর রহমান, স্মরণ, মুরশেদ আলম, সারোয়ার আলম সৈকত, লিখন, মাহবুব, এলিনা পারভেজ, রিমা, ঈশিতা পায়েল, সোমা ফেরদৌস, মিমা জামান তিথি, সোহান প্রমুখ।

উপন্যাস থেকে সিনেমা

২২ বছরের জমিলাকে পাকিস্তানি সৈন্যরা পায় না, পায় তার ৪ বছরের শিশুসন্তানকে। শিশুটিকে তারা ধরে নিয়ে যায়। সন্তান-উদ্ধারের আশায় রাজাকারের পরামর্শে জমিলা গিয়ে হাজির হয় সৈন্যদের ব্যারাকে। শেষতক, নিজের প্রতিজ্ঞা, সাহস, আত্মদানের মধ্য দিয়ে জমিলা তার সন্তানকে উদ্ধার করে। শুধু তাই নয়, এক বীরত্বপূর্ণ অধ্যায় সংযোজন করে মুক্তিযুদ্ধের মহাকাব্যে। একাত্তরের সেই জননী সাহসিনীর গল্প নিয়েই খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিক আনিসুল হকের উপন্যাস 'জননী সাহসিনী ১৯৭১'। আর এই উপন্যাস থেকে '৭১এর মা জননী' সিনেমাটির চিত্রনাট্য তৈরি করেন পরিচালক শাহ আলম কিরণ।

'৭১এর মা জননী'র পেছনের গল্প

২০১২ সালে সরকারের অনুদান পায় সিনেমাটি। শুটিং শুরু হয় পরের বছর আগস্ট মাসে। প্রথম শুটিং হয় এফডিসিতে। এখানে পাকিস্তান আর্মি ক্যাম্পের ভেতরের অংশের কাজ হয়। গ্রামের অংশের শুটিং হয় নরসিংদীর পাড়াটুলি নামে এক গ্রামে। ওখানে ২৫ দিন শুটিং হয়। পাড়াটুলি এমন এক গ্রাম যেখনো ২০১২ সালেও বিদ্যুৎ

পৌঁছায়নি। মুক্তিযুদ্ধের সময় আর পরিবেশকে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য পরিচালক এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করেছিলেন। সিনেমাটির শেষ লটের শুটিং হয় ২০১৪ সালের জুন-জুলাই মাসে, রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে। যুদ্ধের দৃশ্যগুলোতে ওই সময়ের গাড়ি, হালকা ও ভারী অস্ত্র ব্যবহার করেছেন পরিচালক।

৭১এর মা জননী সিনেমার গান

৭১এর মা জননী সিনেমাটির সংগীত পরিচালনা করেছেন সুজেয় শ্যাম এবং আবহ সংগীত পরিচালনা করেছেন ইমন সাহা। সিনেমার গান রচনা করেছেন মুনশী ওয়াদুদ। কণ্ঠ দিয়েছেন এন্ড্রু কিশোর ও আফসানা রুনা। গানগুলোর শিরোনাম 'একটি স্বাধীন দেশ' ও '৭১-এর মা জননী তুমি'।

প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি

৭১এর মা জননী সিনেমাটির দেশে ও দেশের বাইরে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে। এই সিনেমায় অভিনয়ের জন্য ৩৯তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে শ্রেষ্ঠ পার্শ্বচরিত্র অভিনেত্রী হিসেবে পুরস্কার পেয়েছিলেন নন্দিত অভিনেত্রী চিত্রলেখা গুহ।

৭১এর মা জননী সিনেমা নিয়ে নিপুণের মন্তব্য

'৭১এর মা জননী' সিনেমায় দুই বয়সের চরিত্রে অভিনয় করেছেন নিপুণ। সিনেমার গল্প শুরু হয় ষাটোর্ধ্ব এক নারীকে নিয়ে। এরপর গল্প ফিরে যায় ১৯৭১ সালে। এক সাক্ষাৎকারে নিপুণ বলেছিলেন, 'ষাটোর্ধ্ব বয়সের অংশটি নিয়ে আমি বেশি শঙ্কিত ছিলাম। শুটিং শুরুর আগে আমার বাসায় মেকআপ নিয়ে কয়েক দিন মহড়া করেছি। সিনেমায় আমার নাম জমিলা। মুক্তিযুদ্ধের সময় জমিলাকে আর্মি ক্যাম্পে আটকে রেখে দিনের পর দিন শারীরিক নির্যাতন করা হয়। একসময় সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। আমি যতটুকু জেনেছি, আনিসুল হক সত্য ঘটনা অবলম্বনে উপন্যাসটি লিখেছেন। ছবিতে আমিও চেষ্টা করেছি যতটুকু সম্ভব বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরা যায়। পরিচালক শাহ আলম কিরণ আর ক্যামেরায় ছিলেন মাহফুজুর রহমান, তারা দুজনই বাংলা চলচ্চিত্রের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব। আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে চরিত্রটির জন্য। চরিত্র থেকে বের হয়ে স্বাভাবিক হতে আমার অনেক সময় লেগেছে। জমিলার কষ্টের কথা ভেবে মাঝেমধ্যে আমি কেঁদে ফেলেছি। ওই সময় এমন অসংখ্য জমিলা নির্যাতিত হয়েছেন। আমরা তাদের অনেকের খবর জানি না।'

পরিচালকের প্রথম মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা

খ্যাতিমান চলচ্চিত্র পরিচালক শাহ আলম কিরণের প্রথম মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা '৭১এর মা জননী'। এর আগে ২৪টি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন তিনি। কিরণের সিনেমায় থাকে দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিনোদন। এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক

কিরণ বলেন, 'আমার বহুদিনের স্বপ্ন ছিল মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে গল্প গড়ে উঠেছে এমন একটি সিনেমা তৈরি করা। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি এই সিনেমা দিয়ে। আমি মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছি। এর সবকিছু আমার খুব কাছ থেকে দেখা। সেই চিন্তা থেকে সিনেমাটি নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন।'

শাহ আলম কিরণ আরও বলেন, 'অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন আপনি মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্মের মানুষ হয়েও কেন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সিনেমা করেননি। এই জায়গাটা থেকে আমি বেরিয়ে আসতে চেয়েছি। যদিও আমি জানি মুক্তিযুদ্ধ একটা বিশাল বিষয়। আড়াই ঘণ্টার মধ্যে সেলুলয়েডে ধারণ করা খুবই কঠিন। ঠিকভাবে তুলে ধরতে গেলে অনেক সময়, গবেষণা আর অর্থের প্রয়োজন। তারপরও আমি হাল ছাড়িনি। একটি গল্প খুঁজছিলাম। আনিসুল হকের উপন্যাস 'জননী সাহসিনী ১৯৭১' পড়ার পরে আমার মনে হয়েছে এই গল্পটি আমার সিনেমার প্লট হতে পারে। এখানে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের ঘটনা আছে, উনসত্তরের গণআন্দোলনের অনেক ঘটনা আছে বিক্ষিপ্তভাবে। সবকিছু মিলিয়ে এটা নিয়ে একটি সুন্দর মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা হতে পারে। আমি গল্পটি জমা দিই সরকারি অনুদানের জন্য, অনুদানও পেয়ে যাই।'

শেষ কথা

আমাদের জাতীয় জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশকে পাওয়া। একটি জাতির দীর্ঘ নয় মাসের সংগ্রাম নিশ্চয় একটি মহাকাব্য। এ মহাকাব্য রুপালি পর্দায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা শুরু হয় সেই ১৯৭২ থেকেই, যা আজও চলমান। তরুণ প্রজন্মকে জাগাতে আরও অনেক মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা প্রয়োজন। অব্যাহত থাকুক মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা নির্মাণ।